২১

আজকের কাগজ

তারিখ ... 06 JUL 1995 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

গণতন্ত্র ও বাধ্যতামূলক ধর্মশিক্ষা

সুভাষ মণ্ডল

১৪ ফেব্রুয়ারি। ছাত্র আন্দোলনের একটি ঐতিহাসিক দিন। ১৯৯২ সালে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ঘোষিত শিক্ষানীতির রূপরেখা অনুযায়ী প্রথম শ্রেণী থেকে বিজাতীয় ভাষা আরবী ও ইংরেজী বাধ্যতামূলক এবং উচ্চ শিক্ষা সীমিতকরণের কথা আসে। ছাত্র সমাজ এই নীতিকে গণবিরোধী আখ্যায়িত করে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে ১৯৮৩ সালের এই দিনে ছাত্র মিছিলে পুলিশ গুলি চালিয়ে দিপালী সাহা, জাফর, জয়নাল প্রমুখকে হত্যা করে। ওদের আত্মত্যাগের পথ বেয়েই নব্বই-এর গণঅভ্যুত্থান। দীর্ঘ স্বৈরশাসনের পরিসমাপ্তি। স্বৈরাচার পতনের পর জনগণের প্রত্যাশা ছিলো এবার নির্ভয়ে নির্দ্বিধায় বাংলাদেশ তার ঐতিহাসিক বুনিয়াদের উপর ভবিষ্যত প্রজন্ম তৈরির ব্যবস্থাটির অন্তত গোড়াপত্তন করবে। সে অনুযায়ী অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি জনাব সাহাবুদ্দীন আহমেদ অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে টাস্কফোর্স গঠন করে সংবিধানের মৌল নির্দেশনার আলোকে একটি সহায়িকাও তৈরি করেছিলেন। 'ক্ষমতা গ্রহণ করে' বর্তমান সরকার তা গ্রাহ্যে নিলেন না। যার পরিণতি 'যথা পূর্বং তথা পরং' অর্থাৎ সেই ঔপনিবেশিক আমলের সাম্প্রদায়িক ধারা অব্যাহত রইল। ধুরন্ধর বৃটিশ আমলা লর্ড মেকলে উনিশ শতকে সর্বপ্রথম যখন বৃটিশ-ভারতের জন্যে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেন তখন লক্ষ্য ছিলো ভারতীয়দেরকে মানসিকতায় ইংরেজ করা। বৃটিশদের কৃপায় মুসলিম লীগের নেতারা পাকিস্তান পেয়ে শিক্ষানীতির যে পরিবর্তনটুকু এদেশের জন্যে এনেছিলো তা হলো, মানসিকতায় ইংরেজ না হয়ে যাতে সাম্প্রদায়িক হয়। স্বাধীন বাংলাদেশে চারবার শিক্ষা কমিশন বসেছে ইতিপূর্বে। অন্যান্য দেশের তুলনায় শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে পরীক্ষা-নীরিক্ষা এদেশে যে কম হয়নি শিক্ষা কমিশনের সংখ্যাই সে প্রমাণ দিচ্ছে। তবে এর অধিকাংশই ছিলো কুরাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যে। প্রজন্মকে প্রকৃত অর্থে জ্ঞানী, বিজ্ঞানমুখী ও প্রগতিবাদী করে তোলার জন্যে নয়। সংসদীয় সরকারের মেয়াদ পূর্তি হতে চলেছে। অনেকটা মিইয়ে গেছে শহীদদের প্রতি মমত্ব ও প্রতিশ্রুতি। বিগত সময়ে বর্তমান সরকার বিভিন্ন বিষয়ে ১৯টি নীতিমালা প্রণয়ন করলেও শিক্ষা বিষয়ে কোনো নীতি নির্ধারণ করেননি। মেয়াদ পূর্তির অবশিষ্ট সময়ে সম্ভব কি-না সে মর্মে সংশয় রয়েছে। কারণ ইতিমধ্যে বিরোধী দলীয় ১৪৭ জন সাংসদ পদত্যাগপত্র দাখিল করে সরকার পতনের আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। বাংলাদেশের শিক্ষানীতি যেনো গল্পের সেই 'মাংকিজ প' যার কাছে যায় তারই মৃত্যু ঘটে।

ঘন ঘন শিক্ষা কমিশন গঠনের বিষয়টি এ জন্যে অবতারণা যাতে পাঠকের ধারণা নিতে বেগ পেতে না হয় যে, কী পরিমাণ তুলকালাম কাণ্ড ঘটেছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে। আর তার ফল কেমন ফলেছে তা চতুর্পাশে চোখ বুলালেই বোঝা যাবে। সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যবস্থা প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষায়। কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোতে কোনো নিয়মনীতির বালাই নেই। যে যার ইচ্ছে মতো সিলেবাস প্রণয়ন করে তা কোমলমতি শিশুদের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে। কোথাও কোথাও নার্সারী থেকে চালু করা হচ্ছে বাংলা, অংকের পাশাপাশি আরবী ও ইংরেজী। সরকারি প্রাথমিক স্কুলগুলো একই ধরনের পাঠ্যসূচি অনুসরণ করলেও তৃতীয় শ্রেণী থেকে ধর্ম শিক্ষা বাধ্যতামূলক। পাকিস্তান আমলেও প্রাথমিক কিংবা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ধর্ম শিক্ষা বাধ্যতামূলক ছিলো না, ধর্মীয় রাষ্ট্ররূপে ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও না। তথাকথিত ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানকে কবর দিয়ে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বাংলাদেশের জনগণ আজ যে বেশি ধর্ম সচেতন হয়ে উঠেছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। শিশুদের কিশোরদের ধর্ম শিক্ষা অপ্রয়োজনীয় তা নয় বরং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হতে পারে যদি প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে কেবলমাত্র স্বধর্মে শিক্ষিত না করে দেশে প্রচলিত প্রতিটি ধর্ম মতের সাথে পরিচিত করা যায়। আচার-আচরণে ভিন্নতা থাকলেও প্রতিটি ধর্মের মূল সুর যে অভিন্ন তা কী কেউ অস্বীকার করতে পারেন? মিথ্যা কথা বলা পাপ-এ কথা কোনো ধর্মই অস্বীকার করেনি। মঙ্গল করার আকাঙ্ক্ষাই যে ধর্ম, এ জ্ঞান লাভ করার জন্যে শৈশব- কৈশোরই উপযুক্ত সময় এবং বিদ্যালয়ই যথার্থ স্থান। শিক্ষিত করাই যদি অভিপ্রায় হয় তবে দেশে প্রচলিত সকল ধর্ম এবং সব কিছুর উর্ধ্বে যে মানবিক ধর্ম যা সকল ধর্মের মূল কথা, এ শিক্ষাই দেয়া উচিত।

বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে অন্যান্য বিষয়ের সাথে ধর্ম শিক্ষাও অন্তর্ভুক্ত। টেক্সটবুক বোর্ড প্রধান প্রধান ধর্মের শিক্ষার্থীদের জন্যে পৃথক বই প্রণয়ন করেছেন। কিন্তু এর ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধর্ম শিক্ষার নামে ভেদবুদ্ধি প্রচলন তথা সাম্প্রদায়িক চেতনার যে অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন তা কী একবারও ভেবে দেখেছেন? বহুকাল ধরে প্রচলিত ধর্ম মতের বাইরেও অনেক নতুন ধর্ম মতের উদ্ভব এদেশে প্রতিনিয়তই ঘটছে। বাইরে থেকেও নতুন ধর্ম মতের আমদানি হয়ে এখনো নতুন ধর্ম সম্প্রদায়ের পত্তন হচ্ছে। যেমন বাহাই ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়। এ সকল ভিন্ন বিশ্বাস ও আচরণের পরিচয় সম্বলিত পাঠ্যপুস্তক

> বাংলাদেশের মতো একটি দেশে যেখানে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃস্টান ও অন্যান্য সাম্প্রদায়ের লোকদের এক সঙ্গে থাকতে হবে সেখানে এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা অপরিহার্য যেখানে চিন্তার, মত প্রকাশের ও আলোচনার স্বাধীনতা থাকে। সকল ধর্মের অভিন্ন নৈতিক শিক্ষাগুলো সকলের মধ্যে সমানভাবে সঞ্চারিত হয়, সাম্প্রদায়িকতার বদলে মানবিকতার আদর্শ সকলকে উদ্বুদ্ধ করে। শিক্ষায় এ ধরনের সার্বজনীন ধারার প্রতিষ্ঠার বদলে যা চলছে তা শুধু অনাধুনিক ও অবৈজ্ঞানিকই নয়, একান্ত ভাবে মানবিকতা বিরোধী ও আমাদের সংবিধান পরিপন্থি। যা পূর্ববর্তী স্বৈরাচারী সরকারকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। নির্বাচিত বর্তমান সরকারের মেয়াদ পূর্তির পূর্বেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার দুই যুগ পূর্ণ হবে। অথচ আজো আমরা একটি যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা পেলাম না।

প্রস্তুত করে বিদ্যালয়ে পড়ানোর ব্যবস্থা করাতো শিক্ষা কর্তৃপক্ষেরই দায়িত্ব। কিন্তু সে দায়িত্ব পালনের কোনো প্রমাণ নেই। এ রকম দায়িত্ব পালন করা আদৌ সম্ভবও নয়। কারণ, বিশ্বাস ও আচরণের স্থূল-সূক্ষ্ম নানা পার্থক্য থেকেই বিভিন্ন ধর্মের সূচনা যেমন হয়েছে, তেমনি প্রতিটি ধর্ম সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরেও পরস্পর বিরোধী গোষ্ঠীও উপগোষ্ঠীর উন্মেষ ঘটেছে। সে রকম গোষ্ঠী-উপগোষ্ঠীর জন্যে পৃথক পৃথক পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রচারের দায়িত্ব বহন করা কোনো কর্তৃপক্ষের পক্ষেই সম্ভব নয়। বিশ্বের উন্নত দেশসমূহ সে কারণেই সে দায়িত্ব থেকে সরে এসেছে।

ধর্ম বাধ্যতামূলক বিষয় হওয়ায়, কোনো স্কুলে একজনও যদি ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ছাত্র থাকে, তাহলে তাকেও তার ধর্ম অধ্যয়ন করার সুযোগ দিতে হবে এবং তার জন্যে অন্তত একজন শিক্ষক নিয়োগ করার দায়িত্ব ঐ স্কুল কর্তৃপক্ষের ওপর বর্তায়। একটি মানুষের যে অধিকার অন্য নয় জনেরও তো তাই। কিন্তু বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট ভিন্ন। ইসলাম ধর্ম শিক্ষার জন্যে সব স্কুলেই মৌলভী নিয়োগ বাধ্যতামূলক, কেনো মুসলমান ধর্মাবলম্বী ছাত্র না থাকলেও। কিন্তু অন্য ধর্মপুস্তক পড়ানোর জন্যে উপযুক্ত শিক্ষক আছেন এমন স্কুলের সংখ্যা খুবই কম, যেখানে প্রচুর হিন্দু কিংবা বৌদ্ধ ছাত্র রয়েছে। মুসলমান ছাত্ররা যখন ধর্ম শিক্ষার ক্লাস করে, তখন ঐ ক্লাসের হিন্দু, বৌদ্ধ বা খৃষ্টান ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্রাম সুখ উপভোগে মত্ত থাকে, কিংবা হইচই করে অন্যদের পাঠ গ্রহণে ব্যাঘাত ঘটায়। কিংবা এমন কোনো শিক্ষক, ঐ সকল সংখ্যালঘু ছাত্র-ছাত্রীদের ধর্ম শিক্ষার ক্লাস নেন, যিনি সে ধর্ম সম্পর্কে পাঠ দানের অনুপযুক্ত। দেশের বিদ্যালয়গুলোর বর্তমান অবস্থার নিরিখে [illegible] হয় ধর্ম শিক্ষা বাধ্যতামূলক করায় কোমলমতি ছাত্র-শিক্ষার্থীদের নৈতিক মান উন্নত হয়েছে এটি প্রমাণ করা খুব কষ্টকর হবে। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে বর্তমান সংসদীয় সরকার এই বিভেদ সৃষ্টির প্রক্রিয়া থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্ধারে এগিয়ে আসবেন এ প্রত্যাশা গণতন্ত্র প্রিয় প্রতিটি দেশবাসীর।

বাধ্যতামূলক ধর্ম শিক্ষার এসব প্রয়োগিক সমস্যা নিতান্তই বাহ্য। ভেতরকার প্রশ্নটি হচ্ছে একান্তভাবেই নীতিগত। মৌলিক মানবাধিকারের সঙ্গে সে প্রশ্নটি সংশ্লিষ্ট। প্রতিটি ধর্মের একটি সম্প্রদায়গত রূপ নিশ্চয়ই আছে। ধর্মীয় বিশ্বাস এবং বিশ্বাসজাত অনুষ্ঠানের বিভিন্নতাই সৃষ্টি করে সাম্প্রদায়িক ভিন্নতা। কিন্তু এই বাহ্যিক ভিন্নতা সত্ত্বেও ধর্মের যে মূলভাব, তা একান্তভাবেই ব্যক্তিগত। ব্যক্তির যে ব্যক্তিগত বিশ্বাস তার ওপর কোনো সম্প্রদায় বা রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব অনৈতিক। ভাবী নাগরিকেরা যাতে বস্তু জগৎ ও সমাজ জীবনের প্রকৃত পরিচয় জানতে পারে, জীবন যুদ্ধের উপযুক্ত সৈনিক হতে পারে, স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি ও মুক্ত মতিসহ মানবিক মূল্যবোধের অধিকারী হতে পারে, ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলের জন্যে সে রকম শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন করাই রাষ্ট্রের দায়িত্ব। সে রকম শিক্ষালাভ করেই বয়ঃপ্রাপ্ত মানুষ নিজে তার ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি স্থির করে নেবে, নিজস্ব জীবন দর্শন বেছে নেবে। প্রশ্নহীন আনুগত্য নয়, যুক্তিশীল বিচারের পথে অগ্রসর হয়েই মানুষ সঠিক জীবন দর্শন আয়ত্ত করতে পারে। বাধ্যতামূলক ধর্ম শিক্ষা দিয়ে কোনো ব্যক্তিকে বিশেষ ধরনের গণ্ডিতে আবদ্ধ করে ফেলার অর্থ সে ব্যক্তিকে স্বাধীন জীবন দর্শন গঠনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা। এমন প্রতিবন্ধী মানুষ দিয়ে আর যা-ই হোক সুস্থ ও প্রগতিবাদী সমাজ গঠন সম্ভব নয়।

আমাদের এ দেশের সকল মানুষই কোনো না কোনো ধর্মে বিশ্বাস করেন এবং জীবনের প্রতিটি পর্বে ধর্মীয় অনুশাসন ও আচার-অনুষ্ঠান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন। একারণে ধর্ম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে উপেক্ষা করার নয় তবে ধর্ম শিক্ষা বাধ্যতামূলক করলেই সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক মীমাংসা হবে এমনটি আশা করাও সঠিক নয়। শিক্ষাঙ্গনের বর্তমান যুদ্ধংদেহী অবস্থাই সে কথার প্রমাণ দেয়। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্যে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে অনেক দূর পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন। দেশপ্রেমকে সম্প্রদায় প্রেমের উর্ধ্বে স্থান দিতে হবে। ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে দেশের সকল মানুষকে ভালোবাসাই দেশপ্রেম। পৃথিবীর সকল আধুনিক রাষ্ট্র তার নাগরিকদের এই দেশপ্রেমে শিক্ষিত করে তোলার দায়িত্ব বহন করে থাকে এবং এর জন্যে ঐ সকল গণতান্ত্রিক দেশে শিক্ষা ব্যবস্থা এমন যাতে দেশের সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম বিশ্বাস ও আচার-আচরণের সঙ্গে সকলেরই পরিচয় ঘটে। সকল সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা জন্মায়।

বাংলাদেশের মতো একটি দেশে যেখানে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও অন্যান্য সাম্প্রদায়ের লোকদের এক সঙ্গে থাকতে হবে সেখানে এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা অপরিহার্য যেখানে চিন্তার, মত প্রকাশের ও আলোচনার স্বাধীনতা থাকে। সকল ধর্মের অভিন্ন নৈতিক শিক্ষাগুলো সকলের মধ্যে সমানভাবে সঞ্চারিত হয়, সাম্প্রদায়িকতার বদলে মানবিকতার আদর্শ সকলকে উদ্বুদ্ধ করে। শিক্ষায় এ ধরনের সার্বজনীন ধারার প্রতিষ্ঠার বদলে যা চলছে তা শুধু অনাধুনিক ও অবৈজ্ঞানিকই নয়, একান্তভাবে মানবিকতা বিরোধী ও আমাদের সংবিধান পরিপন্থি। যা পূর্ববর্তী স্বৈরাচারী সরকারকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। নির্বাচিত বর্তমান সরকারের মেয়াদ পূর্তির পূর্বেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার দুই যুগ পূর্ণ হবে। অথচ আজো আমরা একটি যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা পেলাম না। বিপুল স্বৈরাচার হটাতে শুধুমাত্র নব্বই সালের ১০ অক্টোবর থেকে ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে ৫০ জনেরও বেশি মানুষকে আত্মবলী দিতে হয়েছে। ক্ষমতাসীনও ক্ষমতাকাঙ্ক্ষী সাংসদদের মল্লযুদ্ধে এই জ্ঞাত-অজ্ঞাত জাতীয় বীরদের প্রত্যাশা হারিয়ে গেলেও জনগণের ভাগ্যের পরিবর্তনের জন্যে যারা রাজনীতি করেন তাঁদের নিকট দেশবাসীর একটিই প্রত্যাশা আমাদের সন্তানদের জন্যে একটি শিক্ষা পদ্ধতি উপহার দিন, যাতে তারা ভবিষ্যতে প্রকৃত মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে পারে। তারা যেনো এ সত্যটি অন্তত জানতে পারে, 'ধর্মের জন্যে মানুষ নয়, মানুষের জন্যে ধর্ম।'

সুভাষ মণ্ডল : লেখক, [illegible]